রাজধানীর ডাকাতি বাণিজ্য

ইমরোজ বিন মশিউর ও
খোন্দকার তানভীর জামিল

বছরের প্রথম থেকেই রাজধানীতে একের পর এক দুর্ধর্ষ ডাকাতির ঘটনা ঘটতে থাকে। ডিএমপি সূত্রে জানা গেছে, গত বছরের তুলনায় এ বছরের প্রথম ৩ মাসে দ্বিগুণ ডাকাতি হয়েছে। এ ব্যাপারে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, ২০০৪ সালে ১৭টি এবং ২০০৫ সালে ৩৫টি ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। এদিকে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) পরিসংখ্যান অনুযায়ী গত বছরের প্রথম ৩ মাসে ২৮টি এবং চলতি বছরের একই সময়ে ৪১টি ডাকাতি হয়েছে। আর গত এপ্রিল এবং মে মাসে রাজধানীর বাসাবাড়িতে কলবেল টিপে অথবা গ্রিল কেটে সংঘটিত ২৫টি দুর্ধর্ষ ডাকাতির ঘটনা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এসব ঘটনায় নগদসহ প্রায় অর্ধকোটি টাকার মালামাল লুট করেছে পেশাদার ও অপেশাদার ডাকাত দলগুলো।

রাজধানীর ২২টি থানার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ডাকাতি হচ্ছে ৭টি থানায়। এগুলো হচ্ছে মিরপুর, খিলগাঁও, শ্যামপুর, কাফরুল, ধানমন্ডি, মোহাম্মদপুর এবং উত্তরা থানা। ১৭ মে ভোরে উত্তরায় ডাকাতির সময় খুন হয়েছেন স্কুল শিক্ষিকা শাহনাজ কবির মিলি। আর ২৮ মে ডাকাতি শেষে পালানোর সময় ওই এলাকায় পুলিশের গুলিতে আনিস নামে এক ডাকাত নিহত হয়। ১৩ মে হাতিরপুলে একটি ডাকাতির ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেপ্তার করতে গেলে গত ১৬ মে ধানমন্ডিতে পুলিশের ওপর ডাকাতদল হামলা চালায়। এতে একজন এসআই আহত হন। তবে পুলিশ একটি ভিডিও ক্যামেরাসহ ৩ ডাকাতকে গ্রেপ্তারে সফল হয়। আর ২০ মে মিরপুরের শেওড়াপাড়ায় পুলিশের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে ৪ ডাকাত নিহত হয়। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ২টি রিভলবার, ৪টি তাজা বোমা, ডাকাতদলের ব্যবহার করা ট্যাক্সিক্যাবসহ চালক মনির হোসেনকে গ্রেপ্তার করে। নিহতদের মধ্যে সোহাগ ও তার এক বন্ধু স্থানীয় সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজ, বাকি দু'জন নিষিদ্ধ ঘোষিত পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টির (এমএল-লাল পতাকা) সদস্য বলে বিশ্বস্ত সূত্রে প্রকাশ। মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে এই অপেশাদার ডাকাতদলটি শেওড়াপাড়া এলাকায় সংঘটিত ৪টি ডাকাতির সঙ্গে জড়িত বলে স্থানীয় একটি সূত্র নিশ্চিত করেছে। মূলত রাজধানী ও এর আশপাশ এলাকায় পেশাদার ও অপেশাদার মিলিয়ে ৩০টির বেশি ডাকাতদল সক্রিয় আছে বলে একাধিক নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে।

ডাকাতি করছে যারা

সাপ্তাহিক ২০০০-এর অনুসন্ধানে কয়েকটি ডাকাতদলের পরিচয় পাওয়া গেছে। গত ১ মাসে সংঘটিত বেশ কয়েকটি ডাকাতির সঙ্গে এ দলগুলো জড়িত বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে প্রকাশ। এর মধ্যে কাফরুল থানাধীন সেনপাড়া-মাদবর পুকুরপাড় এলাকার সক্রিয় ডাকাতদলের নেতা হচ্ছে রনি। এখানেই তার বাসা। তার অন্যতম সহযোগী হচ্ছে খসরু, রনি, কাইল্যা মুন্না ওরফে লম্বু মুন্না, রেজা, তৌহিদ, শরাফত ও মোশারফ (দুই ভাই), দেলোয়ার ওরফে দেলু ওরফে দুলু, পইত্যা বাবু এবং হেলাল। তারা সেনপাড়া, কাজীপাড়ার মাতবর পুকুরপাড় এলাকায়ই বাসবাস করে।

মিরপুর-১৩ নম্বর এলাকার ডাকাতদলের সর্দার হল মনু। তার অন্যতম সহযোগী বাদশা, রনি, মুকুল, কাশেম বাবু, মোশারফ, খালেক লা-শ্যারী বাবু, আজিবর ও চেয়ারম্যান খালেক। এর মধ্যে খালেকের বাবা এক সময় দেশের বাড়ির চেয়ারম্যান ছিল বলে তাকে সবাই চেয়ারম্যান খালেক বলে। আর বাবু মিরপুর-১৪ নম্বর সেকশনের লা-শ্যারী নামক একটি গার্মেন্টসে চাকরি করতো বলে সে লা-শ্যারী বাবু বলে পরিচিত।

কাফরুল থানার আরেকটি দুর্ধর্ষ ডাকাত গ্রুপের সর্দার নাইজ্যা ওরফে ডাকাত নাইজ্যা। সে ইব্রাহীপুরের আশিদাগ এলাকার বাসিন্দা। এ গ্রুপটি উত্তর ও দক্ষিণ ইব্রাহীমপুর, আশিদাগ ও ইব্রাহীমপুর বাজারে ডাকাতি করে থকে। নাইজ্যার সহযোগী বেলাল, শাহ আলম, হক্কা, সাত্তার, জব্বর, চিকনা রনি, তুহিন, ফজা, পল্টু, ব্যায়াম বাবু, রতন, সোহাগ ও চিকা কবির এ এলাকার বাসিন্দা।

মিরপুর থানাধীন ৬ নম্বর সেকশনে ডাকাতিতে সক্রিয় রয়েছে মনির ওরফে ফর্মা মনির গ্রুপ। সে এক সময় মিরপুর থানা পুলিশের ইনফর্মার ছিল। ডাকাতিতে তাকে সহযোগিতা করে মন্টু, ইলিয়াস, ব্যাপারী বাবু, মাইচ্ছ্যা মাসুদ, ইমরান (মাতবর বাড়ী), হযরত আলী, সর্দার খোকন। স্থানীয় বাসিন্দা হওয়ার সুবাদে এরা দিনের বেলায় এলাকায় বিভিন্ন বাসাবাড়ির ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়ে রাতে ডাকাতিতে মেতে ওঠে।

শেওড়পাড়া-জনতা হাউজিংয়ের পশ্চিম কাফরুল এলাকার কানা রশিদ গ্রুপ ডাকাতি করে থাকে। কানা রশিদের সঙ্গে আরো আছে মোচ্ছু হেলাল, আবু কালাম, আমিনুল, দিলনেওয়াজ ওরফে দিলু, নজরুল, ইরানী বাবু, বাচ্চু, নিজাম, জাফর।

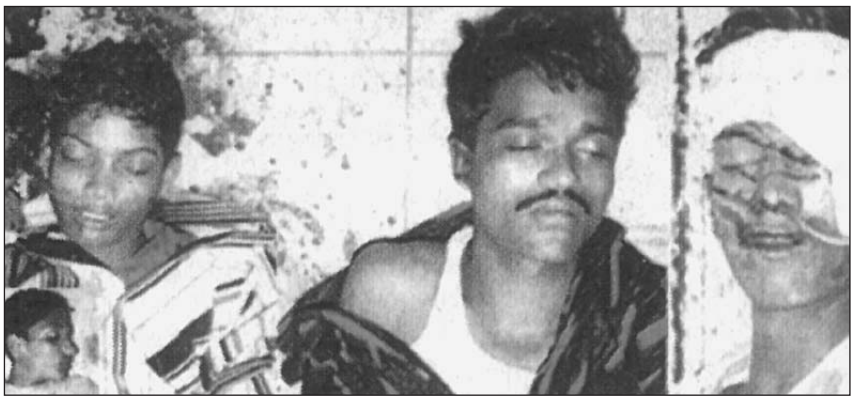

শেওড়াপাড়ায় পুলিশের গুলিতে নিহত চার ডাকাত

মিরপুর থানা এলাকার পশ্চিম কাজিপাড়া ও মনিপুরীপাড়া এলাকার ডাকাতির ঘটনা ঘটাচ্ছে ধলু গ্রুপ। তার সহযোগী হিসেবে আছে আমিন/ইকবাল, খবির মিয়া, সেকান্দার, কলা মজিবর, ওবায়দুর, খাদেম আলী, খোকন, বক্কর, হেমায়েত ওরফে হিমু, শরীফ, তোফাজ্জল ওরফে তাফু এবং মজনু।

পল্লবী থানা এলাকার দুর্ধর্ষ দুটি পেশাদার, ডাকাত গ্রুপ হচ্ছে হিরু মোল্লা ও খালেদ-মোমেন গ্রুপ। এছাড়াও মিরপুর ১ নম্বর এলাকার পলাশ গ্রুপ, বিশিল-আনসার ক্যাম্প, আহম্মদনগর এলাকার কবির/মহসীন গ্রুপ। মোহাম্মদপুর ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকায় নূরে আলম টাইগার কালাম গ্রুপ সক্রিয় বলে জানা গেছে।

ডাকাতি হচ্ছে যেভাবে

জানা গেছে, বর্তমানে ঢাকার অত্যন্ত পেশাদার ও সংগঠিত ডাকাত দলগুলোর পাশাপাশি সন্ত্রাসী-চাঁদাবাজরাও ডাকাতির দিকে ঝুঁকে পড়েছে। একটি বড় মাপের ডাকাতির ঘটনা ঘটাচ্ছে তারা মাত্র ৩০ থেকে ৪৫ মিনিটের মধ্যে। আর প্রতি সপ্তাহে তারা ২ থেকে ৩টি ডাকাতি করছে। একটি বাসায় ডাকাতি করার আগে তারা যে বিষয়গুলো লক্ষ্য করে তা হলো- ১. বাসার অবস্থান এবং আশপাশের ঘরবাড়ি, ২. বাসার নিরাপত্তা ব্যবস্থা, ৩. বাসার মূল্যবান জিনিসের সম্ভাব্য অবস্থান, ৪. সর্বকনিষ্ঠ ও বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্যের পরিচয় ও বয়স, ৫. গৃহকর্তার বাসায় অবস্থান ও অনুপস্থিতির সময়, ৬. গৃহকর্তার ব্যবহার করা মোটরসাইকেল বা গাড়ির নম্বর ইত্যাদি।

ডাকাতির দু'দিন আগে দলের দু'জন সোর্স টার্গেট করা বাসার ওপর সার্বক্ষণিক নজর রাখে। প্রয়োজনে তারা সংগ্রহ করে নেয় বাসার মালিকের ফোন ও মোবাইল নম্বর। অনেক সময় তারা আগ বাড়িয়ে এসে বাসার সর্বকনিষ্ঠ সদস্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ার চেষ্টা করে। অথবা উপযাচক হয়ে গৃহকর্তার কোনো উপকার করে দেয়।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, ডাকাতির সময় সর্বনিম্ন ৮ থেকে সর্বোচ্চ ১৫ জন সদস্য থাকে। এর মধ্যে একজন থাকে সর্দার। একজন পেশাদার গানম্যান, দু'জন সোর্স এবং দু'জন প্যাকার (লুণ্ঠিত মালামাল যারা অতি দ্রুত গুছিয়ে নেয়), বাকিরা ডাকাতিতে তাদের সহায়তা করে। সাধারণত ডাকাতদলের ৩-৪ জনের কাছেই অস্ত্র থাকলেও এর ব্যবহারের দায়িত্ব শুধু দলের পেশাদার গানম্যানের হাতেই থাকে। বাকিরা তাদের অস্ত্র মূলত ভয়ভীতি দেখানোর কাজে ব্যবহার করে থাকে। মজার ব্যাপার হলো, এদের অনেকে অস্ত্র ব্যবহার করতেই জানে না। আর ডাকাতির সময় সোর্স দু'জন বাড়ির বাইরে থেকে চারপাশে নজর রাখে। অবস্থা বেগতিক দেখলে পেজারের মাধ্যমে ডাকাতিরত অন্য সদস্যদের সতর্ক করে দেয়া হয়। ডাকাতি শেষে পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন পথে ঘটনাস্থল ত্যাগ করে।

লুণ্ঠিত মালামালের সিংহভাগই চলে যায় ডাকাত নিয়ন্ত্রক সিন্ডিকেটের হাতে। জানা গেছে, মালামালের মূল্য যদি ১ লাখ টাকা হয় তাহলে দু-এক দিনের মধ্যেই ডাকাত দলের সদস্যদের দেয়া হয় ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকা। আর লুণ্ঠিত মালামাল পরে সিন্ডিকেটের মাধ্যমে টঙ্গী, বোর্ডবাজার, নারায়ণগঞ্জ, সাভার, নবীনগর এলাকায় মোটামুটি প্রকাশ্যেই বিক্রি হয়ে থাকে।

সাধারণত ডাকাত দলগুলো ১ মাস পর পর এলাকা বদল করে থাকে। আর কোন এলাকায় কোন দল ডাকাতি করবে তা নির্ধারণ করে দেয় ডাকাত সিন্ডিকেট। কোনো ডাকাতদল তা অমান্য করলে এর শাস্তিও দেয় সিন্ডিকেট। সাধারণত শাস্তি হিসেবে ওই ডাকাত দলটিকে ১ থেকে ২ মাস পর্যন্ত ডাকাতি করা থেকে বিরত থাকতে হয়। এ নির্দেশ অমান্য করলে মৃত্যু অবধারিত বলে জানা গেছে। মূলত ডাকাত দলগুলো সিন্ডিকেট দ্বারা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। কেউ যদি তাদের নির্দেশ অমান্য করে অথবা ডাকাতি ছেড়ে দিতে চায়, সে ক্ষেত্রে তার ওপর নেমে আসে নির্মম নির্যাতন। ভেঙে দেয়া হয় হাত-পা। কখনো কখনো পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন দুর্ঘটনায় মেরে ফেলা হয় অথবা সারা জীবন টানতে হয় জেলের ঘানি।

প্রতিটি পেশাদার ডাকাতদলেই একজন ওস্তাদ থাকে। সে দলের সদস্যদের নিত্যনতুন কৌশলে ডাকাতি করার ট্রেনিং দেয়। জানা গেছে, প্রাথমিক অবস্থায় ওস্তাদ নিজেই দলের সঙ্গে থেকে ডাকাতি করে। মূলত এ সময় সদস্যদের হাতে-কলমে ডাকাতির কৌশল শেখানোর পাশাপাশি তাদের বিভিন্ন ভুলত্রুটি ধরিয়ে দেয় কথিত ওস্তাদ। এভাবে ৪-৫টি ডাকাতি সংঘটনের পর ওস্তাদ বেরিয়ে যায় দল থেকে এবং দূরে অন্য কোনো এলাকায় চলে যায়। এরপর শিষ্যরা ডাকাতি শেষে নাকি তাকে নিয়মিত রিপোর্টও করে থাকে। ডাকাতির সময় কেউ ধরা পড়লে বা আহত হলে তাকে ছাড়িয়ে আনা এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করে থাকে ওই ওস্তাদ। তাকে টাকা-পয়সা যোগান দেয় ডাকাত নিয়ন্ত্রণকারী সিন্ডিকেট। বিভিন্ন এলাকার কথিত প্রভাবশালী ব্যক্তিরাই এ সিন্ডিকেটের সদস্য বলে জানা গেছে। তবে এরা সব সময়ই থাকে ধরাছোঁয়ার বাইরে। এমনকি খোদ ডাকাতরাও তাদের চেনে না বলে জানা গেছে। তবে এদের পরিচয় জানে ওস্তাদ। মূলত সিন্ডিটের সঙ্গে ডাকাতদলের একমাত্র মিডিয়াম্যান হলো ওস্তাদ। জানা গেছে, এ সিন্ডিকেট প্রয়োজনে পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে পেশাদার ডাকাত এনেও ডাকাতদলের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে।

তবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আমাদের এলিট ফোর্স র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) ডাকাতি রোধে এখন পর্যন্ত সফলতার পরিচয় দিতে পারেনি। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ডাকাতি বাণিজ্য we¯Z n‡"Q। ক্রমেই সংগটিত n‡"Q ডাকাত দল। পুলিশ ব্যর্থ। র‍্যাব কী করে সেটাই এখন দেখার বিষয়।

পুলিশের নিরাপত্তা টিপস!

'সব সময় গেট ও দরজা বন্ধ রাখুন। আগন্তুকের পরিচয় নিশ্চিত না হয়ে গেট খুলবেন না। জরুরি প্রয়োজনে পুলিশকে সংবাদ দিন'। ডাকাতি রোধে নিরাপত্তা টিপস (!) লিখে রাজধানীর পল্লবী, কাফরুল, মিরপুরসহ বেশ কয়েকটি থানা এমন প্রচারণা চালাচ্ছে জনসাধারণের মাঝে। প্রচারণার পাশাপাশি থানাগুলোর ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, কর্তব্যরত কর্মকর্তা, পেট্রোল ইন্সপেক্টর এবং পুলিশ কন্ট্রোল রুমের ফোন ও মোবাইল নম্বর দেয়া হচ্ছে জরুরি প্রয়োজনে যোগাযোগের জন্য। এসব টিপসে তেমন কোনো কাজ হচ্ছে না। বন্ধ হচ্ছে না ডাকাতি। শুধু এই প্রচারাভিযান নয়, ডাকাতি রোধে ঢাকা মহানগরীতে কাজ করছে পুলিশের অর্ধশতাধিক দল। ডাকাতির ঘটনা ঘটছে দিনে-দুপুরে। নগরীতে ডাকাতির ঘটনা এতোটাই বৃদ্ধি পেয়েছে যে, এর পরিসংখ্যান রাখাও এখন কঠিন। তবে সহজভাবে বলা যায়, এখন গড়ে প্রতিদিন ডাকাতির ঘটনা ঘটছে দুটি। মজার বিষয় হচ্ছে, রাজধানীতে ডাকাতির ঘটনা ঘটলেও থানায় অধিকাংশ ডাকাতির ঘটনায় মামলা রেকর্ড হয় হয় চুরির। তাছাড়া মামলা করে কোনো আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না, বরং ভুক্তভোগীদের নানা রকম হয়রানি পোহাতে হয়। এ অবস্থায় অনেকেই মামলা করতে চান না। যার ফলে অনেক ডাকাতির ঘটনাই প্রকাশ পায় না।

প্রবাল রহমান